The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 31 - 58)
Published in July, 2025

পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয় এবং উত্তরণের উপায়: ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বিশ্লেষণ

Climate Change and Environmental Disasters and the Resolutions: An Analysis from Islamic Perspective

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী*

[**Abstract**: Disaster and climate change is a grave crisis of the present world. The elements of environment in an area include everything existing in that particular region. Water, wind, heat, soil, trees, wildlife these all combinedly make an ecological balance suitable for sound and healthy living for human being and wildlife. But, gradually all of these basic elements of our environment are getting polluted and thus it causes ecological imbalance. However, climate change is taking place severely. Deforestation, urbanization, globalization etc., are causing the increase in the use of fossil fuel. As a result, the emission of carbon, methane, clorofurocarbon in the wind is rising in an alarming rate. For the toxic impact of all these pollutions, gradually the environment and climate are getting changed. Because of the ecological imbalance, there come many massive natural disasters. The aim of this article is to know the types of environmental disasters and the ways to stop. Moreover, it also focuses on all the issues of climate change and other environmental problems and their solutions in the lights of the Quran and Sunnah.]

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব মৌলিকভাবে যেসব সমস্যায় আক্রান্ত এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো, পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে বিরাজমান নানা উপাদানে গড়ে ওঠা সকল কিছুই ঐ এলাকার পরিবেশ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। জল, বায়ু, তাপ, মাটি, মাটির গঠন, বৃক্ষরাজি, পশু-পাখি ইত্যাদির ভারসাম্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকার মৌলিক আধার। কিন্তু প্রাকৃতিক যেসব উপাদান পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করে, সেসব উপাদান ক্রমেই দূষিত হয়ে পড়েছে এবং তা সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার পক্ষে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানে দূষণ, যাকে সহজ কথায়, পরিবেশ বিপর্যয় বা দূষণ বলা হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন এ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শিল্প বিপ্লবের পর একদিকে বৃক্ষ উজাড় অন্যদিকে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন নিঃসরণ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। যার বিরূপ প্রভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া ও জলবায়ু। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জলবায়ুর ভারসাম্যহীনতাই প্রধানত দায়ী। ঘন ঘন ও বড় বড় দুর্যোগ তৈরি হয় জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণেই। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ পরিচয়, পরিবেশ বিপর্যয় ও এর প্রকারসমূহ, উত্তরণের উপায় ও প্রস্তাবনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সূচনা ও বিকাশ, ক্ষতিসমূহ এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় ও প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং মৌলিক তাফ্সীর ও ফিকহের আলোকে আলোচেনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবেশের পরিচয়

আভিধানিক অর্থে, পরিবেশ হল, ঠিকানা, অবস্থা ও প্রকৃতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ "আর যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম" (সূরাতুল হজ্ব, ২২ : ২৬)। এখানে بَوَّأْ শব্দ দ্বারা ঠিকানা, ঘর, বসতি বা বাসস্থানকে বোঝানো হয়েছে। যা পরিবেশের আভিধানিক অর্থ হিসেবে গণ্য। পরিবেশকে ইংরেজীতে Environment আর আরবীতে মুহীত (محيط) ও বী'আতুন (بيئة) বলা হয় (আল-বা'আলবাকী ৩১৫)।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। চারপাশের অবস্থা, প্রতিবেশ, পরিবেষ্টন, পরিমন্ডলসহ আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি, পানি ও গাছপালা সম্প্রসারিত দিগন্ত সবই আমাদের পরিবেশ (আহমদ শরীফ ৩৩৭)।

পারিভাষিক অর্থে, পরিবেশ শব্দটির বিষয়বস্তুগত অর্থ ও পরিধি ব্যাপক। পরিবেশ বলতে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ও ভূ-প্রকৃতিগত সকল উপাদানের যৌথ প্রভাব ও পারস্পরিক অবস্থানকে বুঝে থাকি।

ভূ-পৃষ্ঠ হতে ওজন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমণ্ডলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, পাহাড়, নদী, সাগর, উদ্ভিদ ও জীবজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্ট, তাই পরিবেশ। পরিবেশ কোন স্থবির প্রক্রিয়া নয় বরং এটা একটা অনবদ্য প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট স্থানের জীব ও জড়ের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ইকোলজিকাল সিস্টেম। বাস্তব অর্থে পরিবেশ হচ্ছে, প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় ধারার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি (আবুল হায়াত মুহাম্মদ ৫)।

ড. মাহমুদ সালিহ আল-আদেলী বলেন, মানবমণ্ডলীকে বেষ্টন করে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব সৃষ্টি জগত তাকেই বলা হয় পরিবেশ (আল-আদিলী ৭)।

ড. এফ. এম. মনিরুজ্জামান বলেন, "আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি বা যে সমস্ত জটিল উপাদানসমূহ বা বস্তুসম্ভার আমাদের স্বাস্থ্য, ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের উপর কর্তৃত্ব করে তা দিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের পরিবেশ। এক কথায় প্রকৃতির সংগে জীব জগতের যে সম্পর্ক ও সহাবস্থান মূলত তাকেই পরিবেশ বলা হয় (মনিরুজ্জামান ১৯)।

গোপেশ নাথ খান্না বলেন, "Environment and the sum total of all conditions and influences that effects the development and life of organism" (Gophesnath Khanna 12)।

ড. মোঃ সদরুল আমিন বলেন, The situation surrounding us reflecting the joint effects and inter relations of climatologocal and geomorphological factors (ড. মোঃ সদরুল আমিন ১)।

মুঈনুল হক বলেন, মানব জীবনকে বেষ্টন করে যে সৃষ্ট জগত, ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অস্তিত্বমান বস্তু সামগ্রী এবং মানব সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, বৃদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সবগুলো নিয়েই আমাদের পরিবেশ (Moinul Hoque 11)।

বস্তুত পরিবেশ হল বিশ্ব জগতের প্রাকৃতিক বস্তু সামগ্রী যেমন ভূ-পৃষ্ঠ, যেখানে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, সাগর, পানি, লৌহ, বৃক্ষ, ফসল, বায়ু, গ্যাস এবং এ সকল উপাদানগুলোর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফসল যা মানুষের ও জীবজন্তুর উপকারে লাগছে, খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয়, পোশাক, চিকিৎসা ও প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন ইত্যাদির সমষ্টি (N. Manivasakam 1)।

মোটকথা পৃথিবীর সবকিছু, যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ু মণ্ডলের ওজন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যথা, আলো, বাতাস, পানি, মেঘ, কুয়াশা, মাটি, শব্দ, বন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, মানব নির্মিত সর্বপ্রকার অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীমণ্ডল সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাই পরিবেশ। আর এ সকল কিছু মানুষের কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (সূরাতুল ইসরা', ১৭ : ৭০)। ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ "তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৯)।

পরিবেশ বিপর্যয় বা পরিবেশ দূষণ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। মানুষকে নিয়েই এ সমাজ ও পরিবেশের সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া সমাজ ও পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। আবার সমাজ ছাড়া মানুষও চলতে পারে না। পরিবেশ মানুষকে সকল দিক থেকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের এ সহযোগিতা ছাড়া বিপদ সংকুল এ পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করতে পারত না।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কল্যাণে চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশের সকল কিছুকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ "প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে পরিভ্রমণ করছে" (সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ : ৩৩)। সুতরাং মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এ পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষেরই। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ "আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তোমার পালনকর্তা ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছি" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ৩০)। সুতরাং এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে ভূমণ্ডলের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। পরিবেশকে দূষণের হাত হতে বাঁচাতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিকে একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। যদি এর কোন সৃষ্টিকে ধ্বংস করা হয়, তাহলে পুরো পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নেমে আসবে চরম পরিবেশ বিপর্যয়।

পরিবেশ হলো একটি অবস্থার সাথে তার চারপাশের অবস্থাগুলোর (উপাদান) পারস্পরিক ক্রিয়া। মানুষের চারপাশে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট অন্যান্য উপাদান মিলে গড়ে ওঠা যে পরিবেশ, তা যদি মানুষের জীবন ধারণের পথে অন্তরায় হয়ে পড়ে, তখন সেই পরিবেশকে ভারসাম্যহীন পরিবেশ বা দূষিত পরিবেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবেশ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ার প্রধান কারণ হলো দূষণ।

দূষণের কারণ

অসংখ্য কারণে পরিবেশ বিপর্যয় কিংবা দূষিত হতে পারে। বিপর্যয় ও দূষণের চারটি প্রধান ও প্রাথমিক কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি
দুই. ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধি
তিন. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
চার. প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপ

মানুষ তার নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশের ওপর চাপ। মানুষ খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছেদ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য অসংখ্য সামগ্রীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পুরানা জিনিস ফেলে মানুষ নতুনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এতে অপচয়ের পরিমাণ বাড়ছে, বাড়ছে ব্যবহৃত তরল ও কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কলকারখানায় নিত্য নতুন পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে। নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত দ্রব্য ও জ্বালানীর ব্যবহার বেড়ে চলেছে একই সাথে। এর সাথে ইচ্ছা মাফিক অযাচিতভাবে পাহাড় কাটা থেকে শুরু করে প্রকৃতির সকল কিছুতেই মানুষ হস্তক্ষেপ করছে। সব মিলিয়ে পরিবেশকে ক্রমাগত দূষণ করে চলছে এসব কর্মকাণ্ড।

পরিবেশ দূষণের প্রকার

পরিবেশ দূষণ সাধারণত দুই প্রকার, এক. প্রাকৃতিক দূষণ ও দুই. মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ।

প্রাকৃতিক দূষণ: যেসব দূষণরোধ মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অর্থাৎ যে সব দূষণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্ক, হিদায়েত বা মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসেবে পৃথিবীতে সংঘটিত হয়। যেমন অস্বাভাবিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, অতিখরা, অতিবৃষ্টি, সিডর, আইলা, হ্যারিকেন, নারগিস, ভূমি ধস, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরাতুর রূম, ৩০ : ৪১)। অবশ্য এগুলোর অধিকাংশই মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি হিসেবে দিয়ে থাকেন। আর কিছু আছে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ১৫৫)।

মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ: মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের বিভিন্ন প্রকার বা উপাদান রয়েছে তবে মনুষ্যসৃষ্ট দূষণগুলোও প্রাকৃতিক দূষণে দুষ্ট হতে পারে। যেমন মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে যেমন শব্দদূষণ হয় তেমনি বজ্রপাতে ও মেঘের গর্জনেও শব্দদূষণ হয়। আবার মানুষের দ্বারা যেমন বায়ুদূষণ হয়, তেমনি ঝড়-বাতাসের মাধ্যমেও বায়ুদূষণ হয়।

পরিবেশ দূষণ/ বিপর্যয়ের ধরন

সাধারণভাবে পরিবেশ দূষণ/ বিপর্যয়ের চারটি ধরন রয়েছে (John M Invancevich, 150-151)। ১. বায়ু দূষণ, ২. পানি দূষণ, ৩. শব্দ দূষণ, ৪. কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ। এ ছাড়াও রয়েছে শিল্প দূষণ ও আর্সেনিক দূষণ। কোন পরিবেশের বায়ু যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন ঐ পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়েছে বলা যায়। বায়ুতে মিথেন, ফ্লোরোপুরো, কার্বন (সিএফসি), ওজন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন করোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সিসা ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা দূষিত হয়ে পড়ে (U.S. 1)। পানিতে যখন অক্সিজেনের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেই পানি বর্জ্য পরিশোধনে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় Biochemical Oxygen Demand (BOD) (U.S. Council 252)। অর্থাৎ পানিতে BOD -এর মাত্রা বেড়ে গেলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে এবং তা জলজ উদ্ভিদ ও মাছসহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পানি কৃষি কাজসহ মানুষের অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়ে পড়ে অনুপযোগী (ভৌমিক ২৮)।

গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দই হলো শব্দ দূষণ। শব্দের উৎস থেকে আধা মিটার দূরে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ১০০ ডেসিবেল (দৈনিক সংবাদ এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭)। এই মাত্রা থেকে বেশি মাত্রার শব্দ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের পাশাপাশি কঠিন বর্জ্যও নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করে থাকে। যানবাহন, নানারকম কনটেইনার ও প্লাস্টিক সামগ্রী, পলিথিন ব্যাগ, টায়ার, কাগজ, মানুষ এবং পশুর মৃতদেহ ও কংকালসহ অসংখ্য কঠিন বর্জ্য পরিবেশ দূষণে ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে। এসব বর্জ্যকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। কৃষিজাত কঠিন বর্জ্য, শিল্পজাত কঠিন বর্জ্য, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কঠিন বর্জ্য এবং খনিজ কঠিন বর্জ্য।

বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের উৎসকে স্থির ও চলমান এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। স্থির উৎসের মধ্যে শিল্পকারখানা, পাওয়ার প্লান্ট এবং বর্জ্য পদার্থের দহন (Refuse incineration) উল্লেখযোগ্য। চলমান প্রধান উৎস যানবাহনের ধোঁয়া (শর্মিষ্ঠা সাহা আগস্ট ১০, ১৯৯৭)। বাংলাদেশে উভয় উৎস থেকেই বায়ু দূষিত হচ্ছে। তবে শহরে বায়ু দূষণের প্রধান উৎস যানবাহনের ধোঁয়া। ঢাকা মহানগরীতে বাতাসে সিসার (যার উৎস কালো ধোঁয়া) ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বিপজ্জনক পর্যায়ের। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীদের হিসেবে ঢাকার বাতাসে সিসার ঘনত্বের হার প্রতি ঘন মিটারে ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম (এক গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মেক্সিকো সিটি (প্রতি ঘন মিটারে ৩৮৩ ন্যানোগ্রাম) ও ভারতের মুম্বাই শহর (মানিক ২৪)। বাতাসে যেসব উৎস থেকে সিসা মিশ্রিত হয় তার ৯০ ভাগই আসে যানবাহন থেকে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী গাড়িগুলো সিসা ছাড়াও আরো ৪টি পরিবেশ দূষক বাতাসে ছড়াচ্ছে। এগুলো হলো, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রো কার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন (দৈনিক সংবাদ এপ্রিল ৫, ১৯৯৭)। বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিল্প কারখানার ধোঁয়া নির্গমন চিমনি উঁচুতে স্থাপিত না হওয়ার কারণে নির্গত এই ধোঁয়ায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানী ঘটছে ব্যাপকহারে। এদিকে সিসার প্রভাবে স্নায়ুবিক রোগ, বিশেষ করে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। দেশে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, ব্রংকাইটিন, এ্যাজমা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের ব্যাকতার জন্যও দায়ী করা হচ্ছে বায়ু দূষণকে (প্রাগুক্ত)। এর পাশাপাশি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার হুমকি তো রয়েছেই, যে প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বাংলাদেশের মত দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সবচেয়ে বেশি। ডিওই'র হিসেব অনুযায়ী ঢাকা শহরে প্রতিদিন চলাচলকারী প্রায় ২ লাখ ইঞ্জিন চালিত গাড়ির ৮০ শতাংশ ত্রুটিপূর্ণ এবং কালো ধোঁয়ার বেঁধে দেওয়া পরিমাণের সিসা অতিক্রম করে ধোঁয়া ছাড়ছে। কালো ধোঁয়া মূলত অদগ্ধ কার্বন যা ছোট ছোট কণার আকারে নির্গত হয়। এটা ঘটে গাড়ির ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত বোঝা বহন ও ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনের কারণে। ব্যাপক নগরায়নের ফলে গাড়ির সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত। আর ক্রমাগত বায়ু দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। সরু রাস্তা, যানজট, জ্বালানীর নিম্নমান ও দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা দূষণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

দূষণের প্রভাব

বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের নালীতে অস্বস্তি সৃষ্টি করে, মাথা ধরা, কাজে অনীহা, হাঁপানী, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ ও এমন কি ক্যান্সারেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে ঢাকা মহানগরের অধিকাংশ লোকেই এসব রোগের এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিপদ ও জটিলতার শিকার হবে। সিসা

দূষণের জন্যে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। এমনকি তা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। এছাড়াও কিডনীর ক্ষতি ও হাইপারটেনশন সৃষ্টি করে। শিশুদের রক্তে সিসার আধিক্য তাদের কিডনী ও মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা সিসা দূষণে অনেক বেশি হুমকির সম্মুখীন থাকে। ধুলোবালির দূষণ, শ্বাসতন্ত্রে অনেক ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন হাঁপানি। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ু দূষণের প্রধান শিকার শিশুরা। কারণ, তারা বয়স্কদের তুলনায় প্রতি মিনিটে বেশিবার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। ঢাকা মহানগরে বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর ১৫ হাজার মানুষ অকালে মারা যায় এবং কয়েক লাখ মানুষ নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয় (মজুমদার ৮৩)।

বাংলাদেশের কয়েকটি শিল্পে বায়ু দূষণ

টেক্সটাইল ও ডায়িং: বেশ কয়েকটি ধাতু এবং সারফেস ট্রিটমেন্ট কার্যক্রম এসিড কুয়াশা, কণা ও দ্রব্যের ধোঁয়া সৃষ্টি করে। বিষাক্ত দূষণ যেমন নাইট্রাস বাষ্প, ক্রোমিক এসিড ও ক্লোরাইড উদগীরিত হয় এবং শ্রমিক ও আশেপাশের পরিবেশের জন্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সার: নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের সময় লিকেজ থেকে মারাত্মক বায়ু দূষণ ঘটাতে পারে। ফসফেট সার উৎপাদনের সময় ফসফেটের ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো করার সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধুলোর সৃষ্টি হয়, ফ্লোরিনও এর সঙ্গে যুক্ত হয়, অম্লায়ন প্রক্রিয়ার সময়। ট্রিপল ফসফেট (টিএসপি) উৎপাদনের সময় সুনির্দিষ্ট বায়ু দূষণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতীয় পরিবেশের নীতিমালা ১৯৯২ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, যে সব কার্যক্রম পরিবেশকে দূষিত করে ও পরিবেশের অবনতি ঘটায়, সেসব কার্যক্রম সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা। পরিবেশ দূষণকারীদের জবাবদিহিতার মধ্যে এনে দূষণ কার্যক্রমের বন্ধ বা প্রতিরোধ করাই ছিল এই আইনের প্রাথমিক লক্ষ্য। বায়ু মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান। এই পৃথিবীকে বিপর্যয়মুক্ত রাখতে হলে বায়ুকে সকল দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে পাহাড় পর্বত নদীনালা সাগর মরুভূমি ব্যবহৃত অঞ্চল ইত্যাদির অবস্থান, ভূতলের গঠন, আকাশ, প্রকৃতি আর পৃথিবীর আবর্তন, পরিভ্রমণ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ কক্ষপথ পরিভ্রমণ বিষয়ক ভূমণ্ডলীর জ্ঞানের অবদান আবহাওয়া নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ। বছরে ঋতুভেদে স্বাভাবিক বায়ু প্রবাহসমূহ ও মেঘের গমনাগমন এবং ঝড় বৃষ্টি, আর ব্যতিক্রম অবস্থায় সৃষ্টিতে অস্বাভাবিক আবহাওয়া। উল্লেখিত ভূ-মণ্ডলীয় জ্ঞানার্জনের তাকিদ আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানে অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনক সঞ্জীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তারই হুকুমের অধীন আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে। নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ১৬৪)।

স্থান কাল ভেদে আবহাওয়া উপাদানসমূহে বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহ এর উৎপত্তি এলাকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। ভূপৃষ্ঠ হতে উর্ধাকাশ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহের পর্যবেক্ষক আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাতাসের সাথে বাহিত ধুলায় বাষ্পের ঘনীভবনে সৃষ্ট মেঘ অনুকূল অবস্থায় বৃষ্টি ঘটায়। ধুলোয় বাষ্পের

উৎসের দিক হতে তথা সাগরসমূহের দিক হতে প্রবাহিত বাতাস তাই মেঘ বৃষ্টির সম্ভাবনার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলাই বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর সে বায়ু মেঘমালায় সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর তদ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই, এমনিভাবে পুনরুত্থান" (সূরাতু ফাতির, ৩৫ : ৯)।

পানি দূষণ

পানি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত এক বিশেষ নি'আমত। পানির অপর নাম জীবন। পানি না হলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী, খাদ্য, শস্যসহ কিছুই হত না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ "তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল" (সূরাতুন নাহ্ল, ১৬ : ১১-১০)।

এ আয়াত থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, পানি আমাদের জীবন ধারণসহ সকল প্রাণীর জীবন ধারণ, খাদ্য-শস্য উৎপাদনের কত প্রয়োজন। তাই জীবনের প্রতি মুহূর্তে পানির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। পানির অপচয় রোধের একটি হাদীছ হচ্ছে, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ" "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী সা'দ (রা.) ওযুর পানি ব্যবহারে অপচয় করছিলেন দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি পানি অপচয় করছ কেন? সা'দ (রা.) বললেন, ওযুর সময়ও কি পানি অপচয় হয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ! এমনকি যদি তুমি চলমান নদীতেও ওযু কর তাতেও পানির অপচয় হয় (ইবন মাজাহ্ ১৪৩০/২০০৯, হানং ৪২৫, ১/২৭২)।

বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজ এবং কৃষি ও পণ্য উৎপাদনের জন্য পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোর উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য প্রাকৃতিক পানির প্রয়োজন বলতে মিঠা পানির প্রয়োজনই বুঝায়। অথচ শিল্প বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য এবং পারিবারিকভাবে প্ররিত্যক্ত বর্জ্যসহ প্রায় সব ধরণের বর্জ্যই ফেলা হয় মিঠা পানির উৎসগুলোতে। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে মাত্র ৬০ বছর পর মিঠা পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো আর মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবে না (দৈনিক ভোরের কাগজ জানুয়ারী ৫, ১৯৯৭ খ্রি)। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ১৯৯৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের নদী অববাহিকাগুলো শিল্পবর্জ্য এবং কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যে বর্তমান রাসায়নিক দূষণ অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে এসব অববাহিকার ভূমি চরমভাবে অনুর্বর হয়ে পড়বে, এমনকি এগুলো মরুভূমিতেও রূপান্তরিত হতে পারে (প্রাগুক্ত)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, পানি যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে আগামী শতাব্দীর শেষ নাগাদ আমাদের কৃষিতে সেচের জন্য নদীর উপর ভরসা ছেড়ে দিতে হবে। বিশ্বে পানিবাহিত রোগের হার ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এসব দেশে ৮০ শতাংশ রোগ জীবাণু পানিবাহিত। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি মানুষ পানিবাহিত রোগে মারা যায়। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ। শুধুমাত্র পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে আগামী ১০ বছরে

বিশ্বব্যাপী এই খাতে ৬ হাজার কোটি ঢলার যোগান দিতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, উন্নয়নশীল ৮০ টি দেশের ১০০ কোটি মানুষ পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না (প্রাগুক্ত)।

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত জরিফে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ১,২০০ এর বেশি শিল্প কারখানা প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার কিউবিক মিটার বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিতে ফেলে। পরিবেশ অধিদপ্তর নদ-নদীর পানি দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে শিল্প বর্জ্যের কথা বলছে (দৈনিক সংবাদ এপ্রিল ৪, ১৯৯৭ খ্রি)। তীব্র দূষণকারী শিল্প বর্জ্যের কারণে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা, ভৈরব ও কর্ণফুলী নদীর পানি ইতোমধ্যেই দূষিত হয়ে পড়েছে। বুড়িগঙ্গার পানিকে দূষিত করেছে হাজারীবাগের চামড়া শিল্প, নদী তীরবর্তী টেক্সটাইল মিল (ডাইং এণ্ড ফিনিসিং) এবং ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ পয়ঃবর্জ্য। তুরাগের পানি দূষিত হচ্ছে টঙ্গীর শিল্পবর্জ্য দ্বারা। শীতলক্ষার পানি দূষণের কারণ গোদনাইল, কুতুবআইল, সান্তাপুর, পাঠানটুলী প্রভৃতি এলাকার ডাইং ও প্রিন্টিং শিল্প থেকে নদীতে ফেলা বর্জ্য। ভৈরব ও রূপসার পানি প্রধানত গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে। কর্ণফুলী কাগজ কলের বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে কর্ণফুলী নদী। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এসব নদীর পানিতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সেই সাথে কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে এসব নদীর পানি ব্যবহার উপযোগিতা হারাবে (দৈনিক ভোরের কাগজ মে ২৫, ১৯৯৭ খ্রি)।

শব্দ দূষণ

বাংলাদেশে বায়ু ও পানি দূষণের মাত্রা সংকটজনক। সে তুলনায় শব্দ দূষণের মাত্রা তত ভয়াবহ নয়। তবে শহর ও শিল্পাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এর মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত হর্ণ এবং কিছু কিছু কারখানার বিকট শব্দ প্রধানত শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। ঢাকার হাজারীবাগ, রায়ের বাজার, ধোলাইখাল, নারিন্দা, ইসলামপুর, নাখালপাড়া, ইসলামবাগ, তেজগাঁও, মিরপুর এমনকি ধানমণ্ডি ও উত্তরার মত আবাসিক এলাকাগুলোতেও অজস্র শিল্প কারখানা ও যানবাহনের বিরামহীন শব্দ এলাকার বাসিন্দা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে প্রতিনিয়ত দুর্বিসহ করে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তিন বছর বয়সের নিচে কোন শিশুর কানে যদি খুব কাছ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ আসে, তাহলে তার শ্রবণ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। শুধু হাইড্রনিক হর্নই যে ক্ষতির কারণ তা নয়, রেডিও ও টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ার, মাইক্রোফোনের উচ্চ শব্দ, কলকারখানার শব্দ এবং অন্যান্য উচ্চশব্দ ও শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। শব্দ যখন সাধারণ শ্রবণ মাত্রাকে অতিক্রম করে তখন তা দূষিত হয়। কারণ প্রতিটি মানুষের নির্দিষ্ট শব্দমান সহ্য করার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। কান একদিকে মানুষের শ্রবণেন্দ্রীয়, অন্যদিকে মানুষের দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গও। কানের তিনটি অংশ: বাইরের কান, মধ্যবর্তী কান এবং অন্তর্নিহিত কান। শব্দ তরঙ্গ বায়ুর সাহায্যে কানের গহবরে প্রবেশ করে পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। মধ্যবর্তী কানে অবস্থিত তিনটি অস্থির স্পর্শে এই কম্পন আরো প্রবল হয় এবং কানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শ্রবণ কোষ শব্দকে শ্রবণ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এই প্রক্রিয়াই মানুষ শব্দ শুনতে পায় (দৈনিক সংবাদ এপ্রিল ২৬, ১৯৯৭)।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শব্দ মাপ শয়ন কক্ষে ২৫ ডেসিবেল, ডাইনিং বা ড্রয়িং রুমে ৪০ ডেসিবেল, অফিসে ৩৫-৪০ ডেসিবেল, ক্লাসরুমে ৩০-৪০ ডেসিবেল, লাইব্রেরীতে ৩৫-৪০ ডেসিবেল, হাসপাতালে ২০-৩৫ ডেসিবেল, রেস্টুরেন্টে ৪০-৬০ ডেসিবেল এবং রাতের শহরে ৪৫ ডেসিবেল হওয়া উচিত। এই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা দূষণের মাত্রায় পড়ে এবং মানুষের শ্রবণ শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে যা ক্রমে কারো মানসিক ভারসাম্য বিনষ্টের কারণ হতে পারে। শব্দ দূষণের কারনে খিটখিটে মেজাজ ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়। শিশুদের মানসিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন

হয় এবং তাদেরকে পড়াশোনায় অমনোযোগী করে তোলে (কাজী শাহনেওয়াজ তাবি, ৯৪)। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক জরিপ অনুসারে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ মানুষের মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত শব্দ উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদকম্পন, মাথা ধরা, বদহজম, পেপটিক আলসার এবং অনিদ্রার কারণ ঘটায়। দীর্ঘদিন উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করলে যে কেউ বধির হয়ে যেতে পারে। যে কোন ধরনের শব্দ দূষণ সন্তানসম্ভবা মায়ের জন্যে গুরুতর ক্ষতির কারণ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, লস এঞ্জেলেস, হিথ্রো এবং ওসাকার মত বড় বিমানবন্দরের নিকটে বসবাসকারী গর্ভবতী মায়েরা অন্য জায়গার চেয়ে বেশি সংখ্যক পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়।

শিল্প দূষণ

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, তেল, কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার, শিল্পের বর্জ্য, বনজ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। তবে এই দূষণের সব থেকে বড় উৎস হলো সচল শিল্প কারখানার উৎপাদিত প্রক্রিয়া এবং অধিকমাত্রায় যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচলে বিষাক্ত ধোঁয়া ও সিসার ছড়াছড়িতে বায়ু দূষণ। বিশেষ করে শিল্প কারখানায় জ্বালানী ও নানা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে আশেপাশের বায়ু ও পানি ব্যাপক দূষিত হয়ে পড়েছে। একই উৎস থেকে শব্দ দূষণ এবং কঠিন বর্জ্যও সৃষ্টি হচ্ছে।

শিল্প কারখানা থেকে সৃষ্ট দূষণ (শিল্পদূষণ) পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের ওপর ফেলে চলেছে বিরূপ প্রভাব। বায়ু দূষণের মাত্রা পৌঁছেছে আতংকজনক পর্যায়ে। শিল্প বিপ্লবের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকারী প্যানেল (আইপিসিসি)-এর মতে এই মুহুর্তে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস আছে তা ২০২৫ সাল নাগাদ ১.৮ ফা: তাপ বাড়বে এবং পরবর্তী শতাব্দীর শেষ নাগাদ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ফা:। এই অবস্থা যে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়তি তাপে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে শীতের তীব্রতা হ্রাস পাবে। ফলে বরফ গলতে শুরু করবে। ভাঙ্গন ধরবে বরফ জমা মাটির ভিতে। বেরিয়ে আসবে বিপুল পরিমাণ মিথেন। এতে পৃথিবী আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে। বরফ গলা পানিতে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে আরো প্রায় ৮ ইঞ্চি। এ অবস্থায় বাংলাদেশ, সিসিলি ও ইন্দোনেশিয়ার সাগর সংলগ্ন বিরাট এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের জন্য এসব পরিবর্তনের শেষ পরিণতি মোটেই শুভ হবে না বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন। কারণ শুধু আজকের উৎপাদিত কার্বন ডাইক্সাইডের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে আরো ৫০০ বছর। মিথেন ৭ থেকে ১০ বছর, সিএফসি ৬৫ থেকে ১১০ বছর এবং নাইট্রাস অক্সাইড ১৪০ থেকে ১৯০ বছর। আর যদি কোনভাবে এদের উৎপাদন বন্ধ করেও দেয়া হয় তবু পৃথিবীর ভবিষ্যত জেনারেশনকে এই ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের বোঝা বইতে হবে আরো কয়েক শতাব্দী ধরে (ভৌমিক ২৯)। শিল্প কারখানা সৃষ্ট দূষণ যে শুধুমাত্র আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আনছে তাই নয়, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টসহ ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, চর্মরোগ, হৃদরোগ, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডার্মাটোটিস, কনজাংভাইটিসহ অসংখ্য মারাত্মক রোগ ইতোমধ্যেই পৃথিবীর মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে (দৈনিক সংবাদ এপ্রিল ৫, ১৯৯৭)।

আর্সেনিক দূষণ

আর্সেনিক এক ধরনের সাদা রঙের পাউডার, যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এর কিছু কিছু যৌগিক আর্সেনাইট ও আর্সেনেট মারাত্মক বিষাক্ত এবং এগুলো ত্বকের ক্যান্সার, কিডনি, যকৃৎ অকেজো, শ্বাস সমস্যা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে

মৃত্যু ঘটাতে পারে। অন্যান্য অসুখের মধ্যে রয়েছে শরীরে কালচে বাদামী রঙের স্পট, হাতের তালু ও পায়ের তলা মোটা হয়ে যাওয়া এবং হাত-পায়ের চামড়া উঠে যাওয়া ইত্যাদি। বর্ণহীন, স্বাদহীন ও প্রাকৃতিকভাবে মাটির অভ্যন্তরস্থ স্তরে প্রাপ্ত আর্সেনিক এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশছে বছরের পর বছর ধরে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন বাংলাদেশের বদ্বীপ ভূমির নিচে জমা হওয়া আর্সেনিক এসেছে হিমালয় থেকে নদীবাহিত হয়ে বিভিন্ন আকরিকের সঙ্গে। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে নিবিড় সেচ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে এবং আর্সেনিক বিষ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে থাকে প্রথমবারের মত। আর্সেনিক সালফাইভ অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অক্সিডাইজড হয় এবং তা পানির সঙ্গে দ্রবণ সৃষ্টি করে এবং চায়ের ব্যাগ থেকে যেভাবে চা পানিতে শুষে গিয়ে মিশে যায় তেমনি বর্ষাকালে ভূগর্ভস্থ অক্সিডাইজড যৌগ পানিতে গিয়ে মেশে (চৌধুরী ৫৫)।

বিজ্ঞানীরা এখন পরামর্শ দিচ্ছেন যে, এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে হলে কৃষকদের অবশ্যই ভূগর্ভস্থ পানি কম ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থিত পানির ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে। পানির স্তর যখন নিচে নামতে শুরু করে তখন আর্সেনিক সমৃদ্ধ পাইরাইট অক্সিডাইজড প্রক্রিয়া সূচিত হয় এবং সেই বিষ ছড়িয়ে দিতে শুরু করে ভূগর্ভস্থ পানিতে, যার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে হাজার হাজার অগভীর নলকূপ। বাংলাদেশ এখন এই বিষের মরণ ছোঁবলের তালিকায় এবং দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ এই বিষের বিরাট ঝুঁকির মুখে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ভিত্তিক ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ এ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন (নিপসম) ১৭ টি জেলার গ্রামীণ এলাকার ১০০০ টি নলকূপের নমুনা পানি সংগ্রহ করে। এর মধ্যে কমপক্ষে ১৮০ টি নমুনায় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেশের সর্বমোট ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৫৯ টি জেলায় আর্সেনিক আক্রমণের সন্ধান মেলে। এসব জেলার পানিতে আর্সেনিক বিষাক্ততার যে পরিমাণ পাওয়া গেছে, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মাত্রার (০.০১) চেয়ে ২৫ থেকে ৩৫ গুণ বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে ০.০৫ পিপিএম। কিন্তু বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পেয়েছে ১.৫. থেকে ২ পিপিএম। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল (ডিসিএইচ) আর্সেনিক পরিস্থিতির ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, আর্সেনিক বিষে রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। যেসব এলাকায় আর্সেনিক বিষের আক্রমণের বিষয়টি মারাত্মক আকার নিয়েছে সেসব এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দেশের আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকা থেকে সংগৃহীত পানির নমুনায় দেখা যায় আর্সেনিক থাকার স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আক্রান্ত লোকদের ২৮ শতাংশের প্রসাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ বেশি আর্সেনিক রয়েছে, ৪৭ শতাংশের নখে রয়েছে ৮ থেকে ২০ শতাংশ বেশি আর্সেনিক এবং ৯৮ শতাংশের ত্বকে রয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫,০০০ শতাংশ বেশি আর্সেনিক। পানির নমুনার ২০ শতাংশে রয়েছে সহনীয় মাত্রার চেয়ে ১০০ থেকে ৯০০ শতাংশ বেশি আর্সেনিক। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের ৯২০ জন চর্মরোগে আক্রান্ত রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, এদের ১৫০ জন সন্দেহজনকভাবে আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত (ভৌমিক ৩০)।

বন ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণ

এক সময় ছিল যখন পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকাই ছিল বনে আবৃত। সে সময় এমন কথা প্রচলিত ছিল বা লোকজন বিশ্বাস করতো যে, এই বিশাল বনভূমি কোনদিনই উজাড় হবে না। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। নির্বিচারে গাছ

কাটার ফলে বনভূমি এমনই আশঙ্কাজনক পর্যায়ে সংকুচিত হয়েছে যে, পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য হুমকির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এর জন্যে দায়ী শিল্পায়ন ও ক্রমবর্ধমান বনভূমি ধ্বংস হওয়ার কারণ। যথেচ্ছ কাঠ সংগ্রহও বন উজাড়ের একটি কারণ।

১৯৮২ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, বিশ্বে প্রতি বছর ১০ লাখ হেক্টর পরিমাণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। এক দশক পরে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লাখ হেক্টরে। ওয়াশিংটনভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনষ্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে ২০ লাখ হেক্টর বন হারিয়ে গেছে। এই আয়তন বাংলাদেশের আয়তনের চেয়ে বেশি (কাজী শাহনেওয়াজ ৯৪)।

বন হচ্ছে একটি দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রধান উপায়। জীববৈচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বন। গাছ শুধু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত পাতা ও কাঠই সরবরাহ করে না, সেই সঙ্গে বর্ষাকালে মাটিকে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতেও সহায়তা করে মরুকরণ রোধ করে। এভাবে বনের ক্ষতি শুধু পরিবেশগত ভারসাম্যই নষ্ট করে না, সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাও ক্ষতিগ্রস্ত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ইহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অনন্তর ইহা হতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে ইহা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুরবৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন ও ডালিমও। ইহারা একে অন্যে সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি, যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" (সূরাতুল আন'আম, ৬ : ৯৯)। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ "আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে বের করেন। তিনিই তো আল্লাহ্; সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?" (সূরাতুল আন'আম, ৬ : ৯৫)।

উক্ত আয়াতের আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, অংকুর থেকে উদগীরিত বিশাল বনরাজির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কী বিশাল কর্মকৌশল নিহিত রয়েছে।

একটি দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে এবং জনগণের জীবনযাত্রায় বন ও গাছ যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এবার দেখা যাক বাংলাদেশে এসব উপাদান কতটা বিদ্যমান। বন বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন দেশের মোট এলাকার অন্তত ২৫ শতাংশ বন বা গাছপালায় আচ্ছাদিত থাকতে হয় উপরিউক্ত সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্যে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি একেবারেই নাজুক।

বাংলাদেশে ১৯৮০ এর দশকে বন ধ্বংসের পরিমাণ ছিল বছরে ৮,০০০ হেক্টর। কিন্তু সম্প্রতি এফএও পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই হার বছরে ৩৭,০০০ হেক্টর দাঁড়িয়েছে। বন উজাড় হওয়ার ফলে বাংলাদেশে নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যেমন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রবেন্দ এলাকায় মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যদি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তবে বাংলাদেশের এক বিরাট এলাকা মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ

শিল্পায়ন, নগরায়ন, যানবাহন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন শহরের শিল্পাঞ্চলে পরিবেশের মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত হলেও পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতনতা,

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অপরিকল্পিত উৎপাদন প্রক্রিয়া, ক্রটিপূর্ণ যানবাহনের ব্যাপক চলাচল এবং আমদানীকৃত পন্যের নানামুখী ব্যবহার ও ব্যাপকহারে চোরাই পণ্য দেশে আসার কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি অনেক বেশি নাজুক (ভৌমিক ৩৩)।

বাংলাদেশের পরিবেশ অতি দ্রুত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আর একটি প্রধান হলো বনভূমির স্বল্পতা। বৃক্ষ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ এলাকায় বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের মোট ভূমির মাত্র শতকরা ৭ ভাগ এলাকায় বনভূমি আছে। ব্যাপক বৃক্ষ নিধনের কারণে ১৯৭২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের ৯ ভাগ বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ জাপানে বনভূমি মোট আয়তনের শতকরা ৬৩ ভাগ, রাশিয়ায় শতকরা ৫১ ভাগ, আমেরিকায় ৩৪ ভাগ, আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমার এবং ভারতে বনভূমির হার যথাক্রমে শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ২২ ভাগ (মানিক ২১)।

বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের স্বল্প পরিমাণ বনভূমিও ক্রমাগত উজাড় হয়ে গেছে। আর বৃক্ষহীন এই দেশে সামান্য দূষণ প্রক্রিয়াই পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে অনেক বড় আকারে। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দেশের মোট ৭ হাজার ১ শত ৮৫ টি শিল্প কারখানা জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি কারখানাই কমবেশি পানি ও বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। এর মধ্যে ১১৭৬টি কারখানাকে 'তীব্র দূষণকারী শিল্প' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঢাকা বিভাগে ৪৫০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭০টি, খুলনায় এবং রাজশাহী বিভাগে ৬৬টি তীব্র দূষণকারী শিল্প-কারখানা রয়েছে (পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন ১৯৯৪)। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণ করছে ট্যানারী শিল্প। হাজারীবাগ এলাকাতেই রয়েছে প্রায় ৩শ ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ থেকে দৈনিক প্রায় ১৬ হাজার ঘনমিটার শিল্পবর্জ্য ফেলা হয় খোলা আকাশের নিচে।

খুলনায় ছোট বড় প্রায় ৩শ' শিল্প কারখানা থেকে প্রতিদিন এক কোটি গ্যালন তরল বর্জ্য ভৈরব নদীতে ফেলা হয়। শুধুমাত্র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকেই দৈনিক ৪৬ লাখ গ্যালন তরল বর্জ্য ভৈরব নদীতে নির্গত হয় বলে খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় (দৈনিক সোনালী সংবাদ এপ্রিল ২২, ১৯৯৭)। একই কারণে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীও আজ ব্যাপক দূষণের শিকার।

যানবাহনের কালো ধোঁয়া বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের আর একটি বড় উৎস। দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানায় গ্যাসের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় পেট্রোল ও ডিজেল। এই পেট্রোল ও ডিজেল সম্পূর্ণরূপে না পোড়ায় দূষিত ধোঁয়া আসে কারখানাগুলোর চিমনি দিয়ে। এ ছাড়া রোডশেডিং ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য সংস্থায় যে হাজার জেনারেটর ব্যবহৃত হয় তা নির্গত ধোঁয়াও ব্যাপকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে থাকে (ভৌমিক ৩৩)। যানবাহনের কালো ধোঁয়া বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের আর একটি বড় উৎস।

রাসায়নিক সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। ষাট দশক থেকে শুরু করে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে সার ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বছরে ১৭.৩ লাখ মেট্রিক টন (পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন ১৯৯৪)। সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার জমির উৎপাদিকা শক্তিতে দীর্ঘ সমস্যার সৃষ্টি করছে।

আর্সেনিক দূষণ সমস্যা বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণে ভয়াবহ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দেশে ৩ কোটি ৬০ লাখ লোকের জীবন আর্সেনিক বিষক্রিয়ার হুমকির মুখে। ভূগর্ভের পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারই আর্সেনিক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ (দৈনিক ভোরের কাগজ জানুয়ারী ৫, ১৯৯৭)। এ ছাড়া সার, কীটনাশক ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত

ব্যবহারের ফলেও আর্সেনিক সমস্যা সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাবার পানি, আইসক্রিম, ভেজাল দুধসহ বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এভাবে আর্সেনিকযুক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা জটিল রোগে। ঢাকার পরিবেশ দূষণের অন্যতম আর একটি কারণ বিভিন্ন ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে ব্যবহৃত বর্জ্য।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, বিধি বিধান ও তার প্রয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়। 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন ও জারি করা হয় ১৯৯৫ সালে। আইন প্রণয়ন করা হলেও ১৯৯৭ সালের ২৮ শে আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার অভাবে এই আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৯৭ সালে ২৮ শে আগস্ট বাংলাদেশ সরকার গেজেট নোটিপিকেশনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা জারি করলে 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ আইন' প্রয়োগের বাধা দূর হয় (দৈনিক ভোরের কাগজ সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৯৭)। এই আইনে পরিবেশ দূষণকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড এবং ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধানসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই বিধিমালায়। পরিবেশ মানমাত্রা নির্ধারিত না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে কাজ বিঘ্নিত হয়ে আসছিল।

বাংলাদেশে যে ১১১৭ টি শিল্প কারখানাকে তীব্র দূষণকারী শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, পরিবেশ অধিদপ্তর সেসব প্রতিষ্ঠান পরিবেশ নিয়ন্ত্রক ইউনিট স্থাপনের জন্য একাদিকবার নোটিশ দেয়। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় মাত্র ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। বাদ বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো এ নোটিশের কোন তোয়াক্কা করেনি (দৈনিক ভোরের কাগজ মে ২৫, ১৯৯৭)।

সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কর্পোরেশন এলাকায় কোন কারখানা গড়ে তোলার নিয়ম নেই। দেখা যায়, বহু ক্ষতিকর কারখানা তবুও গড়ে উঠছে। প্রতি বছর এ সব লাইসেন্স নবায়নের সময় পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা ছাড়াই ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা হয় (দৈনিক ভোরের কাগজ এপ্রিল ২৬, ১৯৯৭)। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি সিসামুক্ত পেট্রোল আমদানীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই সাথে পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর গ্যাসচালিত গাড়ির সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। এরপরেও শিল্পে উনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্ষতিকর মাত্রায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দেশে বনভূমির স্বল্পতার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে সহজেই। এ অবস্থার মধ্যেও বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। পাশাপাশি দেশের বিপুল অসচেতন জনগোষ্ঠীও পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রেও অনেকের রয়েছে অনীহা। এ পরিস্থিতি হতে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের মাঝে সচেতনতা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে যুক্ত সামগ্রিক তথ্য থেকে এ পর্যায়ে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছে তা হলো,

এক. বাংলাদেশে ক্ষতিকর মাত্রার অধিক এবং ব্যাপকহারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।
দুই. ক্ষতিকর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।
তিন. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই অনীহা রয়েছে।
চার. পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সচেতনতামূলক কোন আন্দোলন নেই।

পাঁচ. পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছে না।
ছয়. দূষণের মানমাত্রা পরিমাপের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব এককভাবে কারো নয়। জনগণ, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকারের যৌথ দায় রয়েছে এ ব্যাপারে।

পরিবেশ বিপর্যয় থেকে উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মালম্বীসহ সকল প্রজাতির প্রাণীর কল্যাণে ও বিশ্ব ব্যবস্থাকে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছে। এ পৃথিবীতে যত প্রাণী আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ “নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আর স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বহান দিয়েছি। আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাদের অনেকের উপর তাদেররকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি” (সূরাতুল ইসরা', ১৭ : ৭০)।

মানুষকে এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের চূড়ান্তরূপ হল খেলাফত প্রদান। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে কেবল শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেনি বরং খেলাফত বা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ “আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্ ফিরিশতাদের বলেছিলেন আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই” (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ৩০)।

পৃথিবীতে মানবজাতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিরূপে সকল কিছু রক্ষার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। অবশ্য এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ জন্য যাতে সত্যিকার দায়িত্ব পালনকারীদের চেনা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ “অতঃপর আমি তোমাদেরকে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর” (সূরাতু ইউনুস, ১০ : ১৪)।

এই দায়িত্ব হল এমন এক ব্যবস্থাপনা যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অধীনস্থ সকল কিছু নিজস্ব গতিতে চলতে পারে। সুতরাং মানুষ ভূমণ্ডলের প্রতিনিধি হওয়ার অর্থই হল মানুষের চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ, জীবজন্তু প্রভৃতি নৃ-তাত্ত্বিক কাঠামোকে যথাযথভাবে রাখা, যথাযথ রাখার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ ভূমণ্ডলে সৃষ্টি থেকে শুরু করে সকল কিছুর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ যদি তার চারপাশের আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে চারপাশের বিপর্যয় অবশ্যই এ ভূমণ্ডল তথা মানব সমাজে হানা দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ “জলে স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের অর্জনেরই ফল” (সূরাতুর রূম, ৩০ : ৪১)।

মানুষের চারপাশে যে জগৎ বিদ্যমান তাই পরিবেশ। আর এ পরিবেশের রক্ষা করা অবশ্যই মানুষের দায়িত্ব। মুসলমানগণ ইসলামের অনুসারী বলে পরিবেশ সংরক্ষণের মূল দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সকল পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের মূর্ত প্রতীক। উদারতা পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম একটি চিত্র। মানুষের চারপাশের যা কিছু আছে সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ “তোমরা কি দেখ না নিশ্চয়

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নি'আমতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন" (সূরাতু লুকমান, ৩১ : ২০)।

আগুন, পানি, বায়ু, মাটি, গাছপালাসহ সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নি'আমত। উল্লেখিত নি'আমতগুলো পরিবেশের বড় উপাদান। মূলত মাটি থেকেই সকল কিছু উৎপন্ন হয়। সুতরাং মাটির গঠন ও ক্ষয়রোধে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ "তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ভূমি। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুর এবং প্রবাহিত করি ঝর্ণা, যাতে তারা ফল খায়" (সূরাতু ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৩-৩৪)।
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে নিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থির করো না, বস্তুত এসব তোমরা জান" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২২)।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ» "তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে। অতঃপর সেখানেই ওযু করবে" (আস-সান্'আনী ১৪০৩, হানং ৩০০, ১/৮৯; ইবন হিব্বান ১৪১৪/ ১৯৯৩, হানং ১২৫১, ৪/৬০)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثلاثَةَ: البَرازَ في المَوَارِدِ، وقارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ" "তিন শ্রেণির অভিশপ্ত লোকদের থেকে বেঁচে থাক। পানির উৎস মূলে, চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়ার স্থানে পায়খানাকারী ব্যক্তি" (আবূ দাঊদ ১৪৩০/ ২০০৯, হানং ২৬, ১/২১)।

পাশাপাশি বৃক্ষরাজি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। আনস (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃক্ষরোপণ করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا» "তোমাদের কারো হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে আর এমতাবস্থায় সে যদি দেখে কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু তার পক্ষে সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই রোপণ করা সম্ভব, সে যেন চারাটি রোপণ করে" (আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফ্রাদ* ১৪০৯/ ১৯৮৯), হা নং ৪৭৯, ১৬৮; আত-তায়ালিসী ১৪১৯/ ১৯৯৯, হা নং ২১৮১, ৩/৫৪৫; আশ-শায়বানী ১৪২১/২০০১, হানং ১২৯৮১, ২০/২৯৬)।

সুতরাং দূষণপূর্ব এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়ে পড়ে। যেমন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের অটোরিকশা রাস্তায় না চালিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ এড়ানো যায়। আর দূষণ পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা হলো পরিবেশ দূষিত হবার পর তা রোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। অবশ্যই শুধুমাত্র পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। কেননা এমন অনেক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত পণ্য রয়েছে যা পরিবেশের সব সময় কিছু না কিছু দূষণ ছড়ায় এবং এগুলোকে উৎসে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সুতরাং দূষণপূর্ব এবং দূর্ষণ পরবর্তী উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সকলের সচেতনতা ও দায়িত্ব রয়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয়রোধে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে প্রস্তাবনা

সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রচার মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। এসব দিক লক্ষ্য রেখে সার্বিকভাবে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে পেশ করা হল,

এক. পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা ঈমানের অঙ্গ। সকলের মাঝে এ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দুই. বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধ সকল স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তিন. পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

চার. পরিবেশ সংরক্ষণে এদেশের আলিম সমাজ বিশেষত মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

পাঁচ. বাংলাদেশ সকল সম্প্রদায়ের আবাসযোগ্য সম্প্রীতি দেশ। সুতরাং সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

ছয়. পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ জোরদার করা প্রয়োজন। শিল্প ও বণিক সমিতিগুলো এ ব্যাপারে সেমিনার ও আলোচনা সভা আহবান করতে পারে। বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রেরও এ ব্যাপারে ভূমিকা রয়েছে।

সাত. সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে এবং প্রতি বছর লাইসেন্স নবায়নের আগে পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী।

আট. প্রতিটি উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা এবং প্রতি বছর তা নবায়নের সময় পরিদর্শনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নয়. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন এবং পরিদর্শকগণ যাতে তাদের কর্তব্যে অবহেলা করতে না পারেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

দশ. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানায় অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য শোধন করার বর্জ্য শোধন প্লান্ট স্থাপনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এগারো. কঠিন বর্জ্যকে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নতুন পণ্যের রূপান্তর করে দূষণ এড়ানো সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প স্থাপন করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

বারো. ঘনবসতি এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান বন্ধ করতে হবে। যেসব ঘনবসতি এলাকায় শিল্প কারখানা রয়েছে সেগুলোকে অবিলম্বে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত।

তেরো. শিল্প স্থাপনা এলাকায় বৃক্ষরোপণ এবং দেশের বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইডের শোষন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

চৌদ্দ. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রোধ এবং আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেচ কাজে গভীর নলকূপের পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

পনেরো. সিসাযুক্ত জ্বালানী তেল আমদানী, দুই ষ্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের গাড়ি সারা দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উঠিয়ে নেয়া, গ্যাস চালিত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ দ্রুততর করা এবং প্রচলিত জ্বালানীর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌর-চুল্লির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ষোলো. দূষণের মানমাত্রা নিরূপণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী।

সতেরো. পরিবেশ সংরক্ষণে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আটারো. এককভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এ জন্যে পরিবেশ সংরক্ষণে আঞ্চলিক এবং ভূমণ্ডলীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উনিশ. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সরকার এই অর্থ প্রাপ্তির জন্য ব্যবসায়ী বিত্তশালী নাগরিকদের ওপর পরিবেশ সংরক্ষণ কর আরোপ করতে পারে। সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির জন্য অচপয় নির্ধারণের মত ব্যবসায় পরিবেশ সংরক্ষণে এ ধরনের তহবিল গড়ে তুলে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।

বিশ. পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রথমত. প্রকৃতি, পরিবেশ সম্পর্কে এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের ধারণা প্রচার। দ্বিতীয়ত. প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের আলোকে নৈতিক আচরণ ও বাস্তব প্রয়োগ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সূচনা ও বিকাশ

পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে বিষয়টি এক সময় মানুষের অজানা ছিল। ১৮২৭ সালে বিজ্ঞানি ফুরিয়ার সর্বপ্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানী টিন্ডাল তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী আরেনিয়াস সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকান্ডের কারণে জলবায়ু বদলের আশঙ্কার দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিজ্ঞানী আরেনিয়াসের সতর্কবাণীর আরো প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে বিশ্ব উষ্ণায়নের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ৮০'র দশকে বিজ্ঞানীরা নিজেদের গণ্ডির বাইরে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগটি অনুভব করাতে সক্ষম হন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৩/৫৩ রেজুলেশনে জলবায়ু পরিবর্তনকে মানব জাতির "Common Concern" হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় International Panel on climate change (IPCC)। এই প্যানেল ইতোমধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ঐ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, যদি গ্রিন হাউস গ্যাস কমানো সম্ভব না হয়, তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরো বেড়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনরোধের জন্য জাতিসংঘ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেও একটি প্রস্তাব পাশ হয়। যার কারণে ১৯৯২ সালে নিউ ইয়ার্কে The United Nations Framework Convention on Climate Change গ্রহণ করা হয়। এটি স্বাক্ষরের জন্য রিওডি জেনারিও ধরিত্রী সম্মেলনে উন্মুক্ত করা হয়। চুক্তিতে মোট ১৫৪ টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে। তারপর থেকে প্রায় প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হয়ে এসেছে (ফউজুল আজিম ৩১)।

প্রতি ৩০ বছরে আবহাওয়ার গুণগত পরিবর্তনকে (তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে) জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হত। আগে ৩০ বছরেও তেমন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হত না, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিবছরই পূর্বের বছর থেকে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৭৫০ সালের শিল্প বিপ্লবের পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তন হলেও তা মানুষের প্রত্যক্ষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। শিল্প বিপ্লবের পর একদিকে বৃক্ষ উজাড় অন্যদিকে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন,

ক্লোরোফ্লোরোকার্বন নিঃসরণ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। যার বিরূপ প্রভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া ও জলবায়ু। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গত দুই শত বছর ধরে নির্বিচারে বন উজাড় ও জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়িয়েছে তিন গুণ। এখন প্রতি বছরে ছয় শ' কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমন্ডলে যুক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ৬০ কি. মি. উচ্চতায় (স্ট্রাটোস্ফেয়ার) ওজন নামক গ্যাসের একটি স্তর আছে যা সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের গাছ-পালা ও প্রাণীদের রক্ষা করে। মানুষ জীবনে আরাম আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য উদ্ভাবন করছে নানা ধরনের গ্যাজেট। এইসব গ্যাজেট থেকে নিঃসৃত হয় এইচসিএফসি গ্যাস। এই গ্যাস বাতাসে ভেসে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরে ফুটো তৈরি করে। তাছাড়া কল-কারখানা ও মোটরযান থেকে নিঃসৃত বায়ু দূষণকারী কিছু গ্যাস যেমন কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এর পরিমাণ অবিরত বায়ুমণ্ডলে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ওজন স্তরকে বিনষ্ট করছে। কোন কোন স্থানে ওজন এর স্তর পাতলা হতে হতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এর মধ্যে দিয়ে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। বরফ গলছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে (হারুন ইবন শাহাদাত ৫)। ফলে বাংলাদেশের ১৭% সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হবে। লবণাক্ততার কারণে প্রায় ৪০% ধানের জমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। ইউরোপীয়ান এ্যাকশন গ্রুপ ওন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ ইউকে-এর সদস্য ড. আকতার সোবহান লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আরো লোমহর্ষক তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "We have to do some thing about climate. The country most at risk is Bangladesh. The prevailing opinion is that 40 percent of land will be inundated by 2050 and an estimated 70 million people will be affected. most of whom will be the poor" (প্রাগুক্ত)।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ যে যে ক্ষতির সম্মুখীন

ভূমিকম্প ও সুনামী ছাড়া সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জলবায়ুর ভারসাম্যহীনতাই প্রধানত দায়ী। ঘন ঘন ও বড় বড় দুর্যোগ তৈরি হয় জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণেই। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি দেশের নির্ধারিত টেরিটরি বা বাউন্ডারি থাকলেও জলবায়ুর কোন বাউন্ডারি নেই। তাই এক দেশ যদি বেশি বায়ু দূষণ করে অন্য দেশেও এর প্রভাব পড়ে (প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব ২০০৮, ২৫ অক্টোবর)। সঙ্গত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশ ১ নম্বর দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (মুহাম্মদ খায়রুল বাশার ২০০৮, ২৫ অক্টোবর)। এর বাস্তবতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন,

এক. বাংলাদেশে বন্যার একটা রুটিন ছিল। যেমন ছোটখাটো বন্যা দুই তিন বছর পরপর, মাঝারি বন্যা চার পাঁচ বছর পরপর, আর ভয়াবহ বন্যা ১০ বছর পরপর হত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা রুটিন মানছে না। এখন দুই তিন বছর পরপরই ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে (ড. আইনুন নিশাত ২০০৭, সংখ্যা-৫)। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আগামীতে প্রতিবছরই ভয়াবহ বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভয়াবহ বন্যার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন,

ক. বাংলাদেশ ভাটির দেশ হওয়ার কারণে উজানের সব পলি পানির সাথে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। যুগের পর যুগ এভাবে প্রবাহিত হওয়ার কারণে নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে। পূর্বে গভীরতা ও খরস্রোত বেশি থাকার কারণে পলি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ত। কিন্তু পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে খরস্রোত কমে যাওয়ায় আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যায়। ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে নদীগুলো স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে নদী ভরাট হয়ে সমতল ভূমির সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বর্ষার মৌসুমে অল্প পানিতেই বন্যার সৃষ্টি হয়।

খ. উজানে পাহাড়ি ঢলের পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে হঠাৎ বন্যার সৃষ্টি হয়।
গ. হিমালয়ের বরফগলা পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
ঘ. ভারত ফারাক্কাসহ বিভিন্ন নদীতে যে বাধ নির্মাণ করেছে বর্ষার মৌসুমে তা একযোগে ছেড়ে দেয়; যা বাংলাদেশের ভরাট নদীগুলো বহন করতে পারে না, ফলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। পরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং করলে বন্যা অনেকাংশেই মোকাবেলা করা সম্ভব। শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

দুই. ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। অনাদি কাল থেকে এদেশের মানুষ ষড়ঋতুর স্বাদ ভোগ করে এসেছে। কিন্তু ষড়ঋতু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন আর আগের মত ষড়ঋতু অনুভূত হয় না। শীতকালের সময় কাল কমে যাচ্ছে। সব ঋতুই যেন একটা এলোমেলো অগোছালো হয়ে এসেছে। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। যশোরে তাপমাত্রা ৪২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। বর্ষাকাল অনেক দেরিতে শুরু হচ্ছে (নাঈম হাসান ৯৯)।

বাংলাদেশের উপরে সম্পাদিত সর্বশেষ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ২০৩০ থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ বর্তমান সময়ের তুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বাড়বে যথাক্রমে ১.০ ও ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০০৯ সালে উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় বাতাসে আগুনের হলকা প্রবাহিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, সময় মত বৃষ্টি না হওয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে আমরা অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। এর কারণ হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ ফসল ষড়ঋতুর সাথে সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঋতুবৈচিত্র্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সময় মত মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত না হওয়ায় বৃষ্টিপাত হয় না, ফলে যথাসময়ে অনেক ফসলের বীজ/চারা রোপণ করা সম্ভব হয় না এতে ফলন কম হয়। আবার কখনও কখনও ফসলের মেনু পরিবর্তন করতে হয় এতে ফলন আরো কম হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে অতিবৃষ্টির চেয়ে অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টির মাত্রা কমে যাওয়াই বেশি লক্ষণীয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে পূর্বের তুলনায় বৃষ্টিপাত ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। যেমন সিলেট অঞ্চলে ২০০৬ সালে জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১৯৩.৯৭ সে. মি., একই সময়ে ২০০৭ সালে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১৮৮.৮৭ সে. মি., ২০০৮ সালে হয়েছিল ১৭৬.৩৭ সে. মি., ২০০৯ সালে হয়েছিল ১৭৭.৭৫ সে. মি.। এভাবে পর্যায়ক্রমে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় সিলেট অঞ্চলে চায়ের উৎপাদন অনেক কমে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের চেয়ে ২০০৮ সালে চায়ের উৎপাদন ছিল দ্বিগুণ আবার ২০০৬ সালে উৎপাদন ছিল তারও দ্বিগুণ (ভূট্টো ২০১০, ৮ জানুয়ারী)।

তিন. জলবায়ু পরিবর্তনে ঘূর্ণিঝড়, আইলা, সিডর, হ্যারিকেন, মোরা, আমপান, জলোচ্ছাস ইত্যাদির প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত শতাব্দীতে ৬৭ টি প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং ৬৪ টি সাইক্লোন হয়েছে (বিশ্বাস ২০০৯, ৫ জুন)। ১৯৮৮ সালে উপকূলবর্তী এলাকায় জলোচ্ছাস, ১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যা, ১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৭ সালে ১৯ মে ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালে ২৫ নভেম্বর সিডর, ২০০৮ সালে মে মাসে নার্গিস, ২০০৯ সালে ২৫ মে আইলা, ২০১৩ সালে ১৬ মে মহাসেন, ২০১৫ সালে ৩০ জুলাই কোমেন, ২০১৬ সালে ২১ মে রোয়ানু, ২০১৭ সালে ৩০ মে মোরা, ২০১৯ সালে ৩ মে ফণী, ২০১৯ সালে ৯ নভেম্বর বুলবুল, ২০২০ সালে ১৯ মে আমফান, ২০২৩ সালে মোখা বাংলাদেশকে একটি বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি করেছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করা না গেলে এ রকম ক্ষতির সম্মুখীন বাংলাদেশকে মাঝে মধ্যেই পড়তে হবে।

চার. বৈচিত্র্যময় পরিবেশ এবং প্রাণী-উদ্ভিদের আবাস এর কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধশালী। বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আয়তনে ছোট হয়েও এ দেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশে প্রায় ৫০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৬৭৭ প্রজাতির মলাস্কা, ১৫৪ প্রজাতির স্বাদু এবং লোনা পানির মাছ, ৩০ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১৫৪ প্রজাতির সরিসৃপ, ৬৫০ প্রজাতির পাখি এবং ১৫৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে (মো: মাহবুবুর রহমান ৫০)।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন প্রতি ২০ মিনিটে ধরণীর বুক থেকে চির বিদায় নিচ্ছে কোন না কোন জীবপ্রজাতি। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস টমাস মনে করেন ২০৫০ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ স্থলচর প্রাণী যোগ দিবে ঐ বিলুপ্তির মিছিলে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি জনসংখ্যার ব্যাপক চাপ, পরিবেশ আইন যথাযথ কার্যকর না থাকা, সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক পশু একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে যেসব পশু একেবারে বিলীন হয়ে গেছে তার তালিকা নিম্নরূপ, ১. এক শিং বিশিষ্ট বৃহৎ গন্ডার, ২. ক্ষুদ্র এক শিং বিশিষ্ট গন্ডার, ৩. এশিয়া দু'শিং বিশিষ্ট গন্ডার, ৪. নীল গাই, ৫. বুনো মহিষ, ৬. গাউর, ৭. বেন্টিং, ৮. বারো শিংগা, ৯. নারিত্রি হরিণ, ১০. নেকড়ে, ১১. সোনালী বিড়াল, ১২. মার্বেল বিড়াল, ১৩. মিঠা পানির কুমির (প্রফেসর কাজী জাকের হোসেন ১৪)।

যে সব পাখি বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে তা নিম্নরূপ, গোলাপী হাঁস, বর্মী বা নীল ময়ূর, বৃহৎ হাড়গিলা, রাজা শকুন, বেঙ্গল ফ্লরিকেন, আর যে সমস্ত পাখি বিলুপ্তি প্রায় তার তালিকা নিম্নরূপ, পাহাড়ি ময়না, নাকতা, হাড়গিলা, বন মোরগ, ডুবডুবি, ঝুটি ডুবডুবি, কানঠুটি, গয়ার বা সাপ পাখি, ওয়াক বা নিশিবক, নলঘোঙা, বড় পানকৌড়ি, মদনটাক, সাদা বুকের সমুদ্র ঈগল, কুড়া, সাপখেকো ছোট ঈগল, মিশরী শকুন, গিন্নি শকুন, তিলাবাজ, গসহক, লাল মাথার বাজ, কোড়া, জলময়ূর, দল পিপি, জলমুরগী, হটটিটি, সাদা হটটিটি, কাঠ চ্যাগা, পান্না ঘুঘু, বড় সবুজ ঠোটের লেজঝোলা, ছোট ও বড় জাতের ভীমরাজ, দুধরাজ ইত্যাদি (চৌধুরী খসরু ২০০৯, ২৬ আগস্ট)।

পাঁচ. উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। BIWTC দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৪৮টি পয়েন্টে জোয়ার-ভাটার পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। পূর্বের তুলনায় এখন মরা কাটাল ও ভরা কাটাল এর সময় পানির উচ্চতার পার্থক্য কতটুকু তা তাদের রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে। BIWTC -এর পাশাপাশি BWDB, CPA, MAP বিভিন্ন পয়েন্টে পর্যবেক্ষণ করেছে। তারাও একই রকম রিপোর্ট দিয়েছে। বিভিন্ন পয়েন্টে জোয়ারের পানির উচ্চতা কি পরিমাণে বেড়েছে তার একটি রিপোর্ট নিচে তুলে ধরা হলো,

Station	Mean Spring Tide	Mean Neap Tide	Mean
Heron point	4.41	1.01	1.71
Mongla	2.65	1.28	1.97
Khepupara	2.36	1.05	1.71
Barisal	1.14	0.62	0.88
Ramadaspar	2.38	1.23	1.81
Charchinga	2.92	1.31	2.72
Chandpur	1.14	0.67	0.91
Sandwip	5.03	2.31	3.67
Chittagong	3.51	2.07	2.79
Cox's Bazar	3.05	1.22	2.14
St. Martin	2.68	0.98	1.83
Average	2.66	1.25	1.97

(M. Shahidul Islam 2001, 11)

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের বাংলাদেশ প্রথম

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সতর্ক না হলে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১ কোটি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মরুকরণের শিকার হয়ে মারা যাবে। আবহাওয়া বিপর্যয়ের জন্য প্রতি বছর ১০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। জাতিসংঘ ভিত্তিক সংস্থা আইপিসিসি-এর ভাষ্য মতে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন। বিশ্বজুড়ে বন্যা, সাইক্লোন, অনাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, অতিগরম, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাভাবিক জীবনধারায় প্রতি বছরই আঘাত এসেছে। জার্মান ওয়াচ গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (সিআর আই) ২০১১ প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। ২০০৭-এ সিডর, ২০০৯-এ আইলা, ২০১০-এ একদিনে রকর্ড পরিমাণে বৃষ্টি, ২০১১-এ শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে বাংলাদেশ। মানুষের বল্যাহীন অপরাধের কারণে বিশ্বপ্রকৃতি আর নিয়ম মানছে না। বিশ্বজুড়ে বৈরী আচরণ করছে আবহাওয়া। ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্বজুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। তুষারপাতের কারণে গোটা ইউরোপ ২০১০ এ শেষের দিকে অচল হয়ে পড়েছিল। আমেরিকায় মাঝে মধ্যেই আঘাত হানছে ক্যাটারিনাসহ বিভিন্ন রকমের ঘূর্ণিঝড়। বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে জাপান, রাশিয়া, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ইউরোপ, কলম্বিয়া, চীন, ভারত ও বাংলাদেশ। বিশ্বের অন্যতম চিনি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিল-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চিনি উৎপাদন কম হওয়ায় বিশ্বের বাজারে চিনির দাম অনেক বেড়ে যায়। মোট কথা ভৌগোলিক অবস্থান, অভ্যন্তরীণ খাদ্য ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনরোধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাবনা

আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনের সবকিছু মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ "তোমরা কি দেখ না! আল্লাহ্ তা'আলা আকশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন" (সূরাতু লুকমান, ৩১ : ২০)। বাস্তবতা হলো, আমরা এসব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমতরাজী অসাবধানতাবশত নষ্ট করে ফেলেছি। কেন না আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জলবায়ু এবং গ্রিন হাউস আমাদের জন্য এক অবারিত নি'আমত। আমাদের বেঁচে থাকার নিয়ামক শক্তি। কিন্তু এগুলোকে আমরা নষ্ট করে নি'আমতের পরিবর্তে গজবে পরিণত করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ "তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নি'আমত দিয়েছিলেন তাঁরা সে নি'আমতকে কুফরে পরিণত করেছে" (সূরাতু ইবরাহীম, ১৪ : ২৮)। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠোর শাস্তি দেন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২১১)। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে তাই। অর্থাৎ মানুষের অপরিকল্পিত সব কিছু ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা নি'আমতের পরিবর্তে গজবে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে যতটুক যা দরকার সেখানে ততটুকু তাই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা, অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি নেই।

তিনি বাতাসে কতটুকু অক্সিজেন, কতটুকু নাইট্রোজেন, কতটুকু নাইট্রাস অক্সাইড, কতটুকু মিথেন, কতটুকু ক্লোরোফ্লোরো কার্বন দরকার ঠিক ততটুকুই দিয়েছেন। মানুষের উচিত এগুলোকে ঠিক করে ব্যবহার করা। কিন্তু

মানুষ সে দিকে খিয়াল না রেখে অপরিকল্পিতভাবে সব কিছু ব্যবহার করেছে। যার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আমাদের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু পরিমিত ও সুবিন্যস্ত করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেকটি জিনিস পরিমিত করে সৃষ্টি করেছি" (সূরাতুল কামার, ৫৪ : ৪৯)। ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ "তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাদের প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে" (সূরাতুল ফুরকান, ২৫ : ২)। ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে" (সূরাতুর রা'দ, ১৩ : ৮)।

মানুষ যদি এগুলোকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করত, তাহলে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু মানুষ অপরিকল্পিত, অপরিমিত ও অযাচিত সব কিছু ব্যবহার করে ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে ওজন স্তরে ও জলবায়ুতে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ফলে মানুষের জন্য তৈরি পরিবেশ মানুষের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে আর মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ১৯৫)।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজ করছে, এতে মানুষ নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের কারণে এ পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। যত বিপর্যয় মানুষের কারণেই হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ "জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তা সবই মানুষের হাতের কামাই" (সূরাতুর রূম, ৩০ : ৪১)। এই আয়াতের পর বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে না। কারণ ওজন স্তর ক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন মানুষেরই কর্মফল। বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত ফ্রেয়ন, মিথেন, নাইট্রাস-অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জন্য মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। মানুষের অপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন এবং বিলাসিতাই ওজন স্তরে ফুটো তৈরির অন্যতম কারণ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী ও কল্যাণকর করে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ "তোমাদেরকে পৃথিবীর স্থলাভিষিক্ত করেছি এবং তা তোমাদের বসবাসের উপযোগী করে তৈরি করেছি" (সূরাতুল আ'রাফ, ৭ : ১০)।
সুতরাং মানুষের প্রয়োজন এ পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

বুদ্ধিভিত্তিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ইতোমধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপ ইসলাম বহির্ভূত নয়। কারণ ইসলামের বিধান মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত, এক. ইবাদত এবং দুই. মু'আমালাত। ইবাদতের বিধান হলো সরাসরি নস তথা শর'ঈ উদ্ধৃতি বা দলিল না পাওয়া পর্যন্ত শুরু করা যাবে না। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট দলিলের ভিত্তিতে ইবাদত করতে হবে। যেমন, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। এমন কোন ইবাদত করা যাবে না যার কোন ভিত্তি পবিত্র কুরআন বা বিশুদ্ধ হাদীছে নেই। আর মু'আমালাতের বিধান হলো নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া যাবে। ইবাদত ছাড়া বাকী সব কিছু মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মুকাবিলা, গ্রিন হাউসের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারোধ বা পরিবেশ উন্নয়নের পদক্ষেপ ইসলামে মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, জলবায়ুর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়েছে, গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের গ্রাস করছে। তাই বলে কি এখান থেকে উত্তোরণের কোন পথ অবশিষ্ট নেই। কিয়োটো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ১৫৪ টি রাষ্ট্র যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। কেন না আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ "মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই" (সূরাতুন নাজম, ৫৩ : ৩৯)।

আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করা: জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের হাতের কামাই। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে সব দুর্যোগ আমাদের উপর আসে; সে সবই নিয়ন্ত্রণ করে কেবল আল্লাহ্ তা'আলা। বড় ধরনের দুর্যোগ আসলে আমরা বলি এটা প্রকৃতির খেয়ালিপনা। বাংলাদেশে বড় বড় বন্যা, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার পর আমাদের জাতীয় গণমাধ্যমগুলো এটাকে প্রকৃতির খেয়ালীপনা বলে প্রচার করেছেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরকের নামান্তর। আসলে প্রকৃতিসহ সব কিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ তো আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। মনে রাখা দরকার আল্লাহ্ তা'আলার অজান্তে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿و وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ "তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি গাছের পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা কিতাবে নাই।" (সূরাতুল আন'আম, ৬ : ৫৯)। ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "যদি সেই সব জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি" (সূরাতুল আ'রাফ, ৭ : ৯৬)। আমাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, عن أَنَس بْن مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» "আনস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবো না বন্ধনমুক্ত রেখে আল্লাহ্ তা'আলর উপর ভরসা করবো? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা কর" (আত-তিরমিযী ১৩৯৫/ ১৯৭৫, হানং ২৫১৭, ৪/৬৬৮)।

সুদ ও ঘুষ বন্ধ করা একান্ত জরুরী: জলবায়ু পরিবর্তনরোধ করতে চাইলে আগে সুদ ও ঘুষ আদান-প্রদান বন্ধ করতে হবে। ঘুষের কারণে সব উন্নয়ন প্রকল্প ব্যাহত হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রকল্প সরকারকে হাতে নিতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭০০ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া গেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ১০/০২/২০১১ তারিখে ১৪০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তনরোধের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১০/০২/২০১১)। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি/ সুদ ও ঘোষের আদান প্রদান বন্ধ করতে হবে। তা না হলে এসব প্রকল্পের অধিকাংশ কাজই সম্পূর্ণ ও মানসম্মত হবে না। ফলে ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। আসলে ঘুষ একটি অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষখোরদের ব্যাপারে বলেছেন, ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ "(হে নবী) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং তাঁরা ঘুষ খায়" (সূরাতুল মায়িদাহ্, ৫ : ৬২)। ছওবান (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا» "ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যস্থতাকারী সকলের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ (আল-হাকিম ১৪১১/ ১৯৯০, হানং ৭০৬৮, ৪/১১৫)।" বনাঞ্চল রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে যারা যুক্ত তাদের নিকট হাদীছের এই বাণী পৌঁছানো দরকার। এতে হয়ত কিছু লোক ঘুষের পথ থেকে ফিরে আসবে। আর যারা ফিরে আসবে না তাদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

দুর্নীতিমুক্ত করা একান্ত জরুরী: দুর্নীতি এবং ঘুষের অবস্থান পাশাপাশি। জলবায়ু পরিবর্তনরোধের সব প্রকল্প দুর্নীতিমুক্ত হওয়া উচিত। দুর্নীতি বন্ধ না হলে দেশী বিদেশী সব ফান্ড শেষ হয়ে যাবে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। এই দুর্নীতি বন্ধের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না" (সূরাতুন নিসা', ২৯ : ৪)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সাহাবীকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করলে সে যাকাত আদায় করে এসে বলল, হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ! এগুলো আপনার যাকাতের মাল আর এগুলো আমার হাদীয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে বসে থাক, দেখ কেউ তোমাকে হাদীয়া দেয় কি না (আল-বুখারী, *আস-সহীহ* ১৪০৭/ ১৯৮৭, হানং ২৪৫৭, ২/৯১৭)।

সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা: যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন রোধ একটি চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী বিষয়। এর জন্য একটি সুন্দর, টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা করা দরকার। তাই দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয়ভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে। দেশের শীর্ষস্থানীয় পরিবেশবিদদের সাথে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে এ ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কর্মসূচি ঠিক করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কেও কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করতে বলেছেন, ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ "কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর" (সূরাতু আল-'ইমরান, ৩ : ১৫৯)।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা অতীব জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের খুরুশকুলে প্রথম পর্যায়ে বিশটি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৩ জুলাই ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে "খুরুশকুল" বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার সদরের খুরুশকুলে নির্মিত পাঁচ তলা বিশিষ্ট ভবনে ২০টি ভবন ৬০০টি পরিবারদের মাঝে বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে ৬০০ ছয়শত পরিবারকে ফ্লাটের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপকূলবাসীকে বেশি করে গাছ লাগানোর আহবান করেন (দ্য ডেইলি স্টার, ২৩ জুলাই, ২০২০ খ্রি)।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কিছু প্রস্তাবনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যা করা যেতে পারে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ অর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় ও অভিঘাত মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

দুই. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা এবং মানব দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়, তা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে সঠিক পথে এগোনো সম্ভব হয়।

তিন. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সম্ভাব্য বিষয়গুলো তীর চিহ্নিত করে তার প্রতিকার ও প্রতিরোধকল্পে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুটনৈতিক এবং পররাষ্ট্র তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

চার. বর্তমানে দেশের সর্বত্র ফ্রি স্টাইলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার চলছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কোন কার্যকর কর্মসূচি নেই। সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঁচ. দেশের মানুষদের মানিয়ে নেবার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন আর্থিকভাবে তাদের ক্ষমতায়িত করা এবং সে লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ছয়. বন্যার ফলে ফসলের যে ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেবার জন্য বন্যা পরবর্তী ফসলের জন্য আগাম প্রস্তুতি করে দেশের কৃষকের কাছে সহজলভ্য করে দেশের কৃষকদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

সাত. ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন যাতে ঘর-বাড়ি ব্যাপক ক্ষতি হতে না পারে, সে ধরনের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য কারিগরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবার কর্মসূচি গ্রহণ করা।

আট. ভূ-উপরিভাগের পানি সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুষ্ঠ নীতিমালা তৈরি এবং সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে কর্মসৃজন করা।

নয়. ভাঙ্গ রোধের জন্য নদী, খাল খনন এবং নদীর প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টিকারী বাধ, ব্রিজ নির্মাণ বন্ধ করা।

দশ. নদীর গতিপ্রবাহের বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান দূর করা। প্রয়োজনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে করা যেতে পারে। দেশের সকল জেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা।

এগারো. দেশের শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে পানি সংরক্ষণের জন্যে কৃত্রিম জলধারার নির্মাণ করতে হবে, যাতে বর্ষাকালে পানি ধরে রাখা যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে তা কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

বারো. চিন্তা, জীবনধারার পদ্ধতি বদলাতে হবে এবং পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তেরো. লবণাক্ততা সহ্যশীল জাতের ধানের উদ্ভাবন করতে হবে এবং লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষকের কাছে এসব প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়ে চাষাবাদ নিশ্চিত করতে হবে।

চৌদ্দ. দেশের সকল রাস্তা-ঘাট উঁচু ও প্রশস্ত করতে হবে, যাতে বন্যাকালীন সময় তার পাশের অঞ্চলের মানুষ রাস্তার পাশে আশ্রয় নিতে পারে।

পনেরো. গ্রামের মানুষের ব্যবহারের জন্যে বায়োগ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কৌশলগত সহায়তাসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। জৈব জ্বালানির বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

ষোলো. প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার এবং সেটা 'ডকট্রিন অব ট্রাস্ট' নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সতেরো. সমন্বিত হাউজিং পরিকল্পনার মাধ্যমে সারাদেশের আবাসন পরিকল্পনা সাজাতে হবে এবং যত্রতত্র বাড়িঘর ও শিল্পকারখানা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

আটারো. সমন্বিত হাউজিং পরিকল্পনার মাধ্যমে সারাদেশের আবাসন পরিকল্পনা সাজাতে হবে এবং যত্রতত্র বাড়িঘর ও শিল্পকারখানা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

উনিশ. শিল্প কলকারখানা স্থাপনের জন্য যুগপোযোগী শিল্প নীতিমালা ও শিল্প জোন গড়ে তুলতে হবে।

বিশ. শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যবহার বিশেষ করে প্রকৃতি ও পরিবেশের শিক্ষা বিষয়ে অধ্যায় সংযোজন করতে হবে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে আমাদের অন্যতম করণীয় হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবই যথাযথভাবে হিফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যদি আমরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদাসীন হই তাহলে গোটা জাতির উপর নেমে আসবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কালো মেঘ। এ পৃথিবীকে আবাসযোগ্য রাখতে হলে কেবল সরকার নয় বরং সকলকেই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভূমিকম্প ও সুনামী ছাড়া সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জলবায়ুর ভারসাম্যহীনতাই প্রধানত দায়ী। ঘন ঘন ও বড় বড় দুর্যোগ তৈরি হয় জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণেই। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি দেশের নির্ধারিত টেরিটরি বা বাউন্ডারি থাকলেও জলবায়ুর কোন বাউন্ডারি নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ অর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় ও অভিঘাত মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তবে সর্ববিষয়ে আল্লাহ্র বিধানকে প্রাধান্য দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

আল-বা'আলবাকী, ড. রূহী, *আল-মাওরিদ*, বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালা'ঈন, ৬ষ্ঠ সং, ২০০২ খ্রি।

আহমদ শরীফ সম্পাতিদ, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি।

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারিক, *পরিবেশ ও ইসলাম*, চট্টগ্রামঃ আল-মদীনা প্রকাশনা, ১ম সং, ২০১৫ খ্রি।

আল-আদিলী, ড. মাহমুদ সালিহ আল-আদিলী, আল-ইসলাম ওয়াল বি'আহ্, আধুনিক ফিকহী গবেষণা পত্রিকা, রিয়াদঃ সৌদিআরব, অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৯৪ খ্রি।

আস-সান্'আনী, 'আব্দুর রজ্জাক ইবন হাম্মাম, আল-*মুসান্নিফ*, তাহকীকঃ হাবীবুর রহমান আল-'আ'জামী, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সং, ১৪০৩ হি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন 'ইসমা'ঈল, *আস-সহীহ*, তাহঃ ড. মুস্তাফা দিব বুঘা, কিতাবুল হিবাহ্, বাবু মান লাম ইয়াকবাল আল-হাদিয়্যাতা লি'ইল্লাতিন রৈরূতঃ দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ খ্রি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আল-'আদাবুল মুফরাদ*, রৈরূতঃ দারুল বাশাইর, ৩য় সং, ১৪০৯ হি/ ১৯৮৯ খ্রি।

আবূ দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, কিতাবুত তাহারাহ্, বাবুল মাওয়াদিইল লাতি নুহিয়া আনিল বূলি ফীহা, বৈরূতঃ দারুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪৩০/ ২০০৯ খ্রি।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *আস-সুনান*, তাহঃ 'ইবরাহীম 'আতুয়া, আব্ওয়াবুয যুহদি, মিসরঃ মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫।

আত-তায়ালিসী, আবূ দাউদ সুলায়মন, *মুসনাদু আবী দাউদ আত-তায়ালিসী*, মিসরঃ দারু হিজর, ১ম সং, ১৪১৯/ ১৯৯৯ খ্রি।

আশ-শায়বানী, 'আহমদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১ হি/২০০১ খ্রি।

আল-হাকিম, মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিলাহ্, *আল-মুস্তাদ্রাক 'আলাস-সহীহায়ন*, তাহঃ মুস্তাফা 'আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ খ্রি।

ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ, *আস-সুনান*, তাহঃ শু'আয়ব 'আরনাউত, আব্ওয়াবুত তাহারাহ্, বাবু মা জাআ ফীল কাসদি ফীল ওযুই, বৈরূতঃ দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি/ ২০০৯ খ্রি।

কাজী শাহনেওয়াজ, শব্দ দূষণ ঝুঁকি, প্রবন্ধ, তাবি।

চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, *গ্রামীণ বাংলাদেশে আর্সেনিকের ছোঁবল* (প্রবন্ধ), (তাবি।

চৌধুরী, খসরু, বাংলাদেশের লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় প্রাণী, দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ আগস্ট, ২০০৯ খ্রি।

ড. মোঃ সদরুল আমিন, *পরিবেশ বিজ্ঞান: মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি।

ড. আইনুন নিশাত, *অন্যদিগন্ত*, সেপ্টেম্বর ২০০৭, সংখ্যা-৫।

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, এপ্রিল ৪, ৫, ২৫, ২৬, ১৯৯৭ খ্রি

দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, জানুয়ারী ৫, এপ্রিল ২৬, মে ২৫, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৯৭ খ্রি।

দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী, এপ্রিল ২২, ১৯৯৭ খ্রি।

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১০/০২/২০১১।

দ্য ডেইলি স্টার, ২৩ জুলাই, ২০২০ খ্রি।

নাঈম হাসান, (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তোমার পৃথিবী, তোমাকেই চায়) পরিবেশ স্মরণিকা, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০০৯, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি।

প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব, 'বায়ুদূষণ রিডাকশনের ক্ষমতা না থাকলেও দূষণের প্রধান ভিকটিম হচ্ছে বাংলাদেশ', দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ অক্টোবর, ২০০৮ খ্রি।

প্রফেসর কাজী জাকের হোসেন, বাংলাদেশের বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর সালতামামি ও একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা, ৫ জুন ২০০৯, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ফউজুল আজিম, জলবায়ুগত পরিবর্তনরোধে পরিবেশ আইনের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, *পরিবেশ স্মরণিকা*, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০০৯, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিশ্বাস, অশোক কুমার, 'বিপন্ন পৃথিবী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' (পরিবেশ স্মরণিকা), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৫ জুন ২০০৯ খ্রি।

ভৌমিক, মলয় কুমার, বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণ: ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব (প্রবন্ধ), আই.বি.এস. জার্নাল ১৪০৪।

ভূট্টো, আব্দুর রব, 'জলবায়ু পরিবর্তনে সিলেট অঞ্চলের কৃষি জীববৈচিত্র্য ও চা শিল্পে বিরূপ প্রভাব' দৈনিক সংগ্রাম, ৮ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি।

মনিরুজ্জামান, ড. এফ. এম., *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭ খ্রি।

মানিক, নুরুল ইসলাম, সম্পাদিত, পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সা.), ঢাকা: ইফাবা, ১ম সং, ২০০৫ খ্রি।

মজুমদার, মোস্তাফা কামাল, বাংলাদেশের বায়ু দূষণ পরিস্থিতি (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের পরিবেশ চিত্র ১৪০৬।

মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন", দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ অক্টোবর ২০০৮ খ্রি।

মো: মাহবুবুর রহমান, (জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যঃ মোকাবেলা জরুরী) পরিবেশ স্মরণিকা, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ জুন ২০০৯, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শর্মিষ্ঠা সাহা, "ব্যাপক বায়ু দূষণের কবলে বাংলাদেশ", দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, আগস্ট ১০, ১৯৯৭ খ্রি।

ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ, *সহীহু ইবন হিব্বান*, তাহকীকঃ শু'আয়ব আরনাউত, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪১৪ হি/ ১৯৯৩ খ্রি।

হারুন ইবন শাহাদাত, "জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে উন্নত দেশগুলো আন্তরিক না হলে বিপর্যয় রোধ করা যাবে না" দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ অক্টোবর ২০০৮ খ্রি।

Gophesnath Khanna, Global Environment Crisis and Management, New Delhi: Ashis publishing house, 1993.

John M Invancevich, Herbert L. Lyon & David P. Adams, Business in a Dynamic Environment, New York: West publishing Co, 1979.

Moinul Hoque, The Environment Protection and Development in the Light of Al-Quran & Hadith: Perpective Bangladesh, Phd Thesis, Islamic University, Kushtia, 2001.

M. SHahidul Islam, Sea level change in Bangladesh. the last ten thousand years, Dhaka: Society of Bangladesh, july 2001.

N. Manivasakam, Environment pollution, New delhi: National Book Trust, 1919.

U.S. Environment Protection Agency, National Emissions Report. U.S.A May, 1976.

U.S. Council on Environment Quality: The 7th Annual Report, Washinggton D.C.U.S. Government printing Office, 1976.